যায়যায়দিন

তারিখ ঃ ১৯-১২-২০২১ (পৃঃ ১৩)

স্বাধীনতার ৫০ বছরে সবচেয়ে বড় অর্জন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

-ব্রি মহাপরিচালক

ডক্টর মো. শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

■ যায়যায়দি রিপোর্ট

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ডক্টর মো. শাহজাহান কবীর বলেছেন, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীনতা। এরপর বড় অর্জন হলো আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। স্বাধীনতার পর যেখানে ৭ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারতাম না, সেখানে আমরা ১৭ কোটি মানুষকে খাওয়ানোর পরও খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকছে। কিছু উদ্বৃত্ত চাল আমরা বিদেশেও রপ্তানি করছি। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে এক অসামান্য অর্জন এবং এই অর্জন সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতাপরবর্তী বঙ্গবন্ধুর সবুজবিপ্লবের ডাক এবং তার কিছু নির্দেশনার ফলে।

মহাপরিচালক বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে যে প্রেরণা দিয়েছেন তাকে কৃষি বিজ্ঞানীরা উৎসাহিত হয়েছে একের পর এক ধানের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করছে। কৃষক সেই জাত মাঠে আবাদ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিপ্লব সাধন করেছে। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপকূলের লবণাক্ত, হাওড়, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ প্রতিকূল পরিবেশে ও জমিতে ফসল উৎপাদনে সরকার এখন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করাতে বাংলাদেশ আজকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের খাদ্য ও কৃষিতে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে। দেশের উর্বর জমি ও পানি জনগণের জন্য বড় আশীর্বাদ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ ভবনের মিলনায়তনে ব্রির নবনিয়োগপ্রাপ্ত ৪০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসের প্রায় ১০০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মো. আবু বকর ছিদ্দিক এবং ডক্টর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী ডক্টর মুন্নুজান খানম। কর্মশালায় গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির প্রশিক্ষণ বিভাগের সিএসও এবং প্রধান ডক্টর মো. শাহাদাত হোসেন। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানরা, আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা প্রধানরা।

কালের কণ্ঠ

তারিখ ঃ ১৮-১২-২০২১ (পৃঃ ১৬)

ধান গবেষণা

জিন বদলে এলো প্রথম সাফল্য

আসছে সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যের নতুন জাতের ধান

শরীফ আহমেদ শামীম,
গাজীপুর ▷

দেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান নিয়ে গবেষণায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। তাদের অর্জনের তালিকায় যুক্ত হতে যাচ্ছে সফলতার আরেকটি পালক। ধানের জিনগত পরিবর্তনে ব্রির বিজ্ঞানীরা এই প্রথম সফলতা পেয়েছেন। তাঁদের সফলতার পেছনে রয়েছে নোবেল পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত 'ক্রিসপার ক্যাস-৯' পদ্ধতি। সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলছেন, এটি মূলত ফসলের জিন পরিবর্তন করার আধুনিক ও বিতর্কমুক্ত একটি প্রযুক্তি।

'ক্রিসপার ক্যাস-৯' প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন জার্মান বিজ্ঞানী ইমানুয়েল চার্পেনিয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্রের জেনিফার দোদনা। এর পর থেকেই বিশ্বজুড়ে ফসলের জাত উন্নয়নে কৃষিবিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ক্রিসপার ক্যাস-৯ প্রযুক্তি। ২০২০ সালের শুরুতে ব্রির ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কীটতত্ত্ববিদ ড. মো. পান্না আলীর নেতৃত্বে দেশের একদল বিজ্ঞানী এ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সম্প্রতি তাঁরা সফলতা পেয়েছেন। সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করে তাঁরা সম্ভাব্য নতুন জাতের ধানের ২৪টি গাছ পেয়েছেন। এতে উজ্জীবিত হয়ে গবেষণা জোরদার করেছেন তাঁরা।

ব্রির বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ক্রিসপার ক্যাস-৯ পদ্ধতিতে সুগন্ধি বৈশিষ্ট্য এবং মাজরা ও কারেন্ট পোকা (বাদামি ঘাসফড়িং) প্রতিরোধী জিন ঢুকিয়ে ধানের নতুন জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে।

ব্রি সূত্রে জানা যায়, ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে ক্রসিং ও সিলেকশন, হাইব্রিডাইজেশন, মিউটেশন ইত্যাদি পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে আসছেন। পরে আসে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ক্রপ (জিএমও) প্রযুক্তি। তবে জিএমও ফসল নিয়ে বিশ্বজুড়ে রয়েছে নানা মতভেদ। ক্রিসপার ক্যাস-৯ প্রযুক্তিটি আধুনিক ও বিতর্কমুক্ত। ড. পান্না আলী জানান, তাঁরা চাল সুগন্ধি করা এবং মাজরা ও বাদামি ঘাসফড়িং পোকা বিরোধী ধানের জাত উন্নয়নে কাজ করছেন। প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে সুগন্ধি ধানের ফলন অনেক কম। এ কারণে কৃষকরাও এই ধানের জাত চাষ করতে চান না। কিন্তু সুগন্ধি চালের দাম অনেক বেশি। দেশে-বিদেশে রয়েছে বিশাল বাজার। তা ছাড়া মাজরা ও কারেন্ট পোকার কারণে কৃষকরা ১০ থেকে ১৮ শতাংশ ফলন হারান। এই পোকা দমনে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়, যা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। পান্না আলী বলেন, 'এসব চিন্তা থেকে আমরা সুগন্ধি চাল এবং মাজরা ও কারেন্ট পোকা প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনে গবেষণায় হাত দিই।'

ব্রির এ গবেষক জানান, দেশে বেশি চাষ হওয়া ব্রি ধান ৮৭, ব্রি ধান ৮৯ ও ব্রি ধান ৯২ জাতের মধ্যে ক্রিসপার ক্যাস-৯ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে সুগন্ধি বৈশিষ্ট্য ঢোকানো হয়। সেই সঙ্গে প্রবেশ করানো হয় মাজরা ও বাদামি ঘাসফড়িং প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ গবেষণায় সুগন্ধি চালের ও পোকা প্রতিরোধী ২৪টি ধানগাছ পাওয়া গেছে। ধানের শীষগুলো পাকতে শুরু করেছে। আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে কৃষকদের কাছে বীজ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানান ড. পান্না আলী।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবির বলেন, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রি উচ্চ ফলনশীলসহ ধানের ১০৬টি জাত উদ্ভাবন করেছে। মুজিববর্ষে এসে আমাদের সফলতার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী ধানের জাত। এটি ব্রির একটি যুগান্তকারী সফলতা।'

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের একদল বিজ্ঞানী সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করে সম্ভাব্য নতুন জাতের ধানের ২৪টি গাছ পেয়েছেন। ছবি : সংগৃহীত

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখ ঃ ১৮-১২-২০২১ (পৃঃ ৬)

বিজয়ের পঞ্চাশ : কৃষি খাতে অর্জন কী

বশিরুল ইসলাম

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তীতে এবারের বিজয়ের মাস বাঙালির কাছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে এসেছে। ৯ মাসের যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনতে অনেক হারাতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। লাখো শহীদের রক্ত কি বৃথা গেছে? নাকি যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল লাখো মানুষ, তাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে? স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি-না এমন প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার বিষয়ে নানা মহলের প্রশ্ন থাকলেও ৫০ বছরে দেশের অর্জন কিন্তু কম নয়। একসময়ের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আজ 'উপচেপড়া ঝুড়িতে' রূপ নিয়েছে। খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে বাংলাদেশ আজ রপ্তানিকারকে পরিণত হয়েছে।

১৯৭০ থেকে ৭১ সালে দেশে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল এক কোটি ১০ লাখ টন। তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য এই পরিমাণ খাদ্য পর্যাপ্ত ছিল না। বর্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে চার কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। যদিও এ সময়ের ব্যবধানে আজ দেশের মানুষ বেড়ে আড়াইগুণ হয়েছে। আবাদি জমি কমেছে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। আর এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর ধরে ধান উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় ইন্দোনেশিয়াকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ এখন বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের হিসাবে, দেশে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ কোটি ২৬ লাখ টন ধান উৎপন্ন হয়েছে, যা বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ। চীন ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টন উৎপাদন করে প্রথম, আর ভারত ১১ কোটি ৬৪ লাখ টন উৎপাদন করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

মৎস্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডফিশের তথ্য মতে, বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৬ শতাংশ এখন উৎপাদিত হচ্ছে বাংলাদেশেই। দেশের চাহিদার মেটানোর পাশাপাশি কূটনীতিতেও ব্যবহার হচ্ছে মাছের রাজা ইলিশ। ২০০৮ থেকে ২০০৯ অর্থবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২ লাখ ৯৯ হাজার মেট্রিক টন। ২০১৯ থেকে ২০২০ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। এই সময়ে উৎপাদন বেড়েছে ২ লাখ ৫১ হাজার মেট্রিক টন বা ১ দশমিক ৮৩ গুণ। সেই সঙ্গে আকারেও বড় হয়েছে ইলিশ। একসময় বাজারে এক কেজি ওজনের ইলিশ পাওয়া দুরূহ ছিল, সেখানে বর্তমানে দুই কেজি কিংবা তার চেয়েও বড় আকারের ইলিশ বাজারে সচরাচর পাওয়া যাচ্ছে।

'সোনালি আঁশ' পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। মোট পাট উৎপাদিত হয় ১৩ লাখ ৪৫ হাজার টন, যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৪২ শতাংশ। ২০ লাখ টন উৎপাদন করে ভারত বিশ্বে প্রথম। বিশ্বের ৫৫ শতাংশ পাট ভারতে উৎপাদিত হচ্ছে। ৪৫ হাজার টন উৎপাদন করে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশ প্রথম। বাংলাদেশ পাট থেকে প্রায় ২৮৫ রকমের পণ্য তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর রপ্তানি করছে।

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। উৎপাদনের পাশাপাশি সবজি রপ্তানি বাড়ছে প্রতিবছর। এখন দেশে ৬০ ধরনের ও ২০০টি জাতের সবজি উৎপাদিত হচ্ছে, যার সঙ্গে জড়িত ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার। আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ষষ্ঠ। এফএওর হিসাব অনুযায়ী, গত বছর দেশে আলুর উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৯ লাখ টন। প্রতি হেক্টর জমিতে এখন গড়ে সাড়ে ২৩ টন আলুর ফলন হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় এখন অনেক বেশি আলু দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের আলু রপ্তানি হয়।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বে আম উৎপাদনে অষ্টম। বছরে উৎপাদন হয় ২৪ লাখ টন। ১০ বছর আগে ১২ লাখ ৫৫ হাজার টন নিয়ে অবস্থান ছিল দশম। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সপ্তম স্থানেও উঠেছিল। আম উৎপাদনে সবার ওপরে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। এছাড়া বিশ্বে বছরে ৩৭ লাখ টন কাঁঠাল উৎপাদিত হয়। এ ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে। বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ১০ লাখ টন। বিশ্বে সর্বোচ্চ ১৮ লাখ টন কাঁঠাল হয় ভারতে। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড। ১০ লাখ ৪৭ হাজার টন পেয়ারা উৎপাদন করে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম স্থানে। ১ কোটি ৭৬ লাখ টন নিয়ে ভারত প্রথম এবং ৪৪ লাখ টন উৎপাদন করে চীন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

২০১৪ সালে ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে গরু আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেশেই গবাদিপশুর লালনপালন বাড়তে থাকে। গরু ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। গরু-ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈশ্বিক অবস্থানে বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে। এফএওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছাগলের সংখ্যা, মাংস ও দুধ উৎপাদনের দিক থেকে বৈশ্বিক সূচকে ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। আর ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। ছাগল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দুই দেশ হচ্ছে ভারত ও চীন।

ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ১০৬টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। দেশে এখন পর্যন্ত ১৮টি ফসলের ১১২টি জাত আবিষ্কার করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)। ১১৫টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ২০০৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ফসলের ৩০৬টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে ৩৬৩টি। ধান বাদে অন্য সব ধরনের ফসল নিয়ে গবেষণা করা এই সংস্থা বর্তমানে ২১১টি ফসল নিয়ে গবেষণা করছে। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনিযুক্ত ৪৪টি ইক্ষু জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতসমূহের গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১০০ টনেরও বেশি এবং চিনি আহরণের হার ১২% এর উর্ধ্বে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছে।

বর্তমান যুগকে বলা হয় আধুনিক প্রযুক্তির যুগ। বিশ্বে প্রতিদিন নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে। আমাদের কৃষক এসব টেকনোলজি সহজে গ্রহণ করতে পারছে না। বাংলাদেশের কৃষি মেকানাইজেশনে এগুচ্ছে কিন্তু মেকানাইজেশনের পাশাপাশি ডিজিটাইলেজেশনেও এগুতে হবে। স্মার্টফোনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সেবা গ্রহণ, স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে স্মার্ট ফার্মিং বা স্মার্ট এগ্রিকালচার বা প্রিসিশন এগ্রিকালচার পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হতে হবে। পৃথিবীতে নতুন নতুন যেসব যন্ত্রপাতি আসছে, সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অব থিঙ্কস। যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধি ও রোবোটিকস, জৈব প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সয়েললেস এগ্রিকালচার, ডিপওয়াটার ইরিগেশন, হাইড্রোপনিক, এরোপনিক, কৃষিতে ড্রোন ব্যবহার, ন্যানো প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

পুরনো আমলের চাষাবাদ প্রথাগি পরিবর্তন করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদে মনোযোগী হতে হবে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষি কর্মকর্তাদের সক্রিয় সহযোগিতা তাদের এ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। পাশাপাশি দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কৃষিপণ্যের ন্যায্য দামও নিশ্চিত করতে হবে।

সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ জরুরি। পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন দরকার। সরকারের সঠিক নীতি সহায়তা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তাভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তি অনেকাংশেই সহজতর হয়েছে। এসডিজি ২০৩০, রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্ল্যান : ২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলেই কৃষিসহ সব ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তব রূপ পাবে।

মোট কথা, করোনা সংক্রমণের কারণে দেশের সবকিছু যখন স্থবির, তখনও সচল ছিল কৃষির চাকা। দুঃসময়ে কৃষিই সম্ভাবনার পথ দেখাচ্ছে। শুধু করোনা সংকটে নয়, গত ৫০ বছরে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলে কৃষি বার বার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এসেছে বিস্ময়কর সাফল্য ও অভাবনীয় উন্নতি।

[লেখক : উপপরিচালক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়]